দৈনিক সংবাদ

প্রকাশ 12 NOV 1993 পৃষ্ঠা 4

অশিক্ষার বিরুদ্ধে মানববন্ধের মশাল

অনিরুদ্ধ

ইউনেস্কোর ৪৮তম বার্ষিকী পালিত হল এবার। জাতিসংঘের কয়েকটি বিশেষ অংগ সংগঠন বা সংস্থা রয়েছে। তার মধ্যে ইউনেস্কো একটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর (ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জুন মাসে) জাতিসংঘ গঠিত হল পৃথিবী থেকে যুদ্ধ দূর করে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে।

জাতিসংঘের বহমুখী কর্মসমূহ সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা ও কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আওতায় ১৭টি বিশেষ অঙ্গসংগঠন আর তার বাইরে একটিমাত্র অঙ্গ সংগঠন রয়েছে জাতিসংঘের যা এই ১৭টি অঙ্গসংগঠনের মতই স্পেশালাইজড এজেন্সী এবং অন্যান্য এজেন্সীর মত তাহল আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা। এটি সরাসরি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধীন। একথা হয়তো আমাদের অনেক সময় খেয়াল থাকে না যে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল জাতিসংঘের বিশেষায়িত (স্পেশালাইজড) সংস্থা। এর উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব এবং এর কার্যকলাপের দাপটে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এই দুটি সংস্থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা পরোক্ষভাবে চালিত মনে করে। এদের কার্যক্রমের প্রকৃতি এবং ক্ষেত্র জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গসংস্থা থেকে ভিন্ন ধরনের। এরকম আর একটি সংস্থা হল গ্যাট (জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন টেরিফ এন্ড ট্রেড)।

ইউনেস্কো প্রসঙ্গে উপরের কথাগুলো এজন্য বললাম যে, জাতিসংঘের মতই ইউনেস্কো পৃথিবীতে যুদ্ধ পরিহার ও শান্তির লক্ষ্যে কাজ করে। তবে জাতিসংঘের এই লক্ষ্য ও কর্ম প্রচেষ্টার সঙ্গে ইউনেস্কোর কর্মধারা এবং তা সম্পাদনের মাধ্যমের প্রকৃতি একেবারেই ভিন্ন। জাতিসংঘ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধের সম্ভাবনা ও কারণসমূহ দূর করার জন্য কূটনীতি, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আলোচনা, সাধারণ পরিষদে উত্থাপন এবং নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার উপর জোর দিয়ে থাকে। জাতিসংঘের শান্তি স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা কূটনীতি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় ছাড়িয়ে অবস্থার মূল পর্যন্ত প্রসারিত নয়। সেখানে ইউনেস্কো নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য মানুষের শিক্ষা ও চেতনার ওপর জোর দিয়েছে। মানুষের মন হল যুদ্ধ এবং শান্তির উৎস। মানুষের মনকে শান্তির জন্য তৈরি করার ওপর তাই ইউনেস্কো জোর দিয়েছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য যুদ্ধ পরিহার করে শান্তির জন্য জাতিতে জাতিতে সমঝোতা ও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণগুলো দূর করার জন্য এবং শান্তি স্থাপনের জন্য এই ভূমিকার সঙ্গে ইউনেস্কোর বিশ্বশান্তির জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলোর পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক। রাজনীতির অঙ্গন বহির্ভূত সমাজ জীবনের বহদূর বিস্তৃত তার কর্মসূচী।

তাই ইউনেস্কোর উদ্দেশ্য ও পটভূমি সম্পর্কে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। ইউনেস্কোর পুরো নাম হল United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. (জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা)। ইংরেজী নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে সংক্ষেপে ইউনেস্কো। ১৯৪৫ সালের ১লা মে থেকে ১৬ মে পর্যন্ত জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি অঙ্গসংগঠন গঠনের জন্য লন্ডনে প্রতিনিধিরা মিলিত হন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির শিক্ষামন্ত্রিগণ নিয়মিতভাবে লন্ডনে মিলিত হতেন। সেখানে তারা যুদ্ধের কারণে দুর্বল কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা ও ভাবনা চিন্তা করতেন। তারও আগে প্রথম মহাযুদ্ধের পর গঠিত লীগ অব নেশনস্ আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সহযোগিতা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমর্থন যুগিয়ে আসছিল। প্যারিসে এই সংগঠনের সদর দফতর ছিল। এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী এবং জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যুরোকে ইউনেস্কোর মডেল হিসেবে নেয়া হয়েছে যখন ১৯৪৫ সালে নভেম্বরে জাতিসংঘের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠনের জন্য প্রতিনিধিরা মিলিত হন। সেখানে একজন বৃটিশ মহিলা বিজ্ঞানী মিস লুউস্ কিনসন বিজ্ঞানকেও এর অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন। এই আলোচনার ভিত্তিতে একটি খসড়া দাঁড় করানো হয়। আলাপ আলোচনা শেষে ১৯৪৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর ইউনেস্কো গঠিত হয় এবং ২০টি দেশ ইউনেস্কো গঠনতন্ত্র অনুমোদন দেয়। ইউনেস্কো সকল জাতির জন্য ন্যায়বিচার, আইন, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সম্পর্কে সচেতনতা, বৃদ্ধি এবং এসবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এর সদর দপ্তর হল প্যারিসে। এখন ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৬৩।

ইউনেস্কোর ৪৮তম বার্ষিকী বাংলাদেশে পালিত হয়েছে, কিন্তু এ নিয়ে সরকারী মহলে খুব বেশি উদ্যোগ আয়োজন দেখা যায়নি আনুষ্ঠানিকতার বাইরে। ঢাকার জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য হল বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির উদ্যোগে এই দিনটি পালন, সেখানে ইউনেস্কো কলিঙ্গ পুরস্কারপ্রাপ্ত ডঃ আবদুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দিন খুব সংক্ষেপে ইউনেস্কোর গঠন প্রসঙ্গে কীভাবে বিজ্ঞানকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হল তা বলেন। তিনি বলেন যে, ইউনেস্কোর লক্ষ্য হল শান্তির জন্য প্রয়োজন শিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। তাই সাক্ষরতা অভিযানের জন্য সাক্ষরতা বর্ষ পালন এবং ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা শ্লোগান নিয়ে ইউনেস্কো অগ্রসর হচ্ছে। জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ্য ও শান্তির ভিত্তি তৈরি করতে হলে মানুষের মনকে আলোকিত করেই শান্তির শক্তিকে উন্মোচিত করা সম্ভব। রাষ্ট্র জাতির সীমান্ত অতিক্রম করে মানব জাতিকে শান্তির পথে চালিত করাই অধিকতর ফলপ্রসূ। এই অনুভব ব্যক্ত হয়েছে ইউনেস্কোর গত ৪৮ বছরের কর্মসূচীতে। ধীরে ধীরে যেমন ফুলের দল (পাপড়ি) মেলে তেমনি ইউনেস্কো তার কর্মসূচীতে ক্রমপর্যায়ে গ্রহণ করেছে বিভিন্ন কর্মসূচী যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শিক্ষা। আজ পৃথিবীর ৫৫০ কোটি মানুষের মধ্যে ৯৫ কোটি মানুষ নিরক্ষর। এই নিরক্ষরতার সংখ্যা তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে সর্বাধিক। এক হিসেবে দেখা গিয়েছে তৃতীয় বিশ্বে সবচেয়ে বেশি নিরক্ষর ভারতে। সেখানে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ২৪ কোটি ১০ লাখ। চীনে ২২ কোটি ৪০ লাখ বাংলাদেশে ৪ কোটি ৩০ লাখ এবং পাকিস্তানে ৪ কোটি ২০ লাখ। জনসংখ্যা অনুপাতে বাংলাদেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেশি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি সাক্ষরতার হার শ্রীলঙ্কায়। শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোক সেখানে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। ১৯৮৯ সালের ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপিডিয়াতে এই সাক্ষরতার হার শতকরা ৮৭ ভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ৩৫ ভাগ (উপরোক্ত এনসাইক্লোপেডিয়াতে বলা হয়েছে শতকরা ২৫ ভাগের মত)। দু' হাজার সালে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পর এই শিক্ষিতের হার ২০০০ সাল নাগাদ শতকরা ৬০ ভাগের বেশি করা সম্ভব হবে কিনা এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

ইউনেস্কো তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য ও অশিক্ষার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে দেখেই শিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছে। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিঃ এমবোয়া এই লক্ষ্যে ইউনেস্কোর কর্মসূচীতে ব্যাপক রদবদল করলে শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলো ইউনেস্কোর কর্মকান্ডে উদ্বেগ প্রকাশ করে। শিক্ষা খাতে অধিক অর্থ বরাদ্দ এবং সামরিক ব্যয়ের বিরুদ্ধে তৎকালীন ইউনেস্কো মহা পরিচালক এমবোয়া ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। ইউনেস্কোর কর্মকান্ড যতই ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার সম্পর্কে মত বিরোধও বাড়তে থাকে। ইউনেস্কোর নতুন সদস্য রাষ্ট্রগুলো বিশেষভাবে তৃতীয় বিশ্বের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ইউনেস্কো তার সম্পদ কীভাবে সুষ্ঠু ব্যবহার করবে তা নিয়ে নতুন নতুন ভাবধারার আমদানি করে। ১৯৫৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনেস্কো ত্যাগ করে। তার অভিযোগ ইউনেস্কো তার দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বর্ণবাদ সমস্যায় হস্তক্ষেপ করছে। ইউনেস্কো পাশ্চাত্য বিরোধী মনোভাব পোষণ করে এই অভিযোগ এনে ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কো ত্যাগ করে। পরের বছর বৃটেনের রক্ষণশীল থ্যাচার সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে ইউনেস্কো থেকে বেরিয়ে আসে। আর সিঙ্গাপুর এই বলে ইউনেস্কো ত্যাগ করে যে, ওই সংস্থার তহবিলে তার জন্য ধার্য চাঁদার পরিমাণ নাকি খুব বেশি।

মিঃ এম্বোয়া ইউনেস্কোর মহাপরিচালক থাকাকালে যে বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্রোধান্বিত করেছিল, তাহল নিউ ইনফেরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ওয়ার্ল্ড অর্ডার অর্থাৎ নয়া বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ বিশ্ব ব্যবস্থা নীতিকে ইউনেস্কোর অন্যতম কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ। এই প্রসঙ্গে ইউনেস্কোর অভিমত ছিল তথ্য আদানপ্রদান ব্যবস্থাকে উন্নততর করা যাতে একতরফাভাবে কিছু দেশ চিরকাল গ্রহীতা এবং কিছু দেশ দাতা না থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত এই নয়া বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত ইউনেস্কোর ঘোষণা পত্রটি ১৯৭৮ সালে অনুমোদিত হয়। এতে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে একমুখী প্রবাহ থেকে দ্বিমুখী করার উদ্দেশ্য নেয়া হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল দেশের নিজস্ব তথ্য মাধ্যম সৃষ্টির কাজে সহায়তা প্রধান লক্ষ্য।

১৯৮৮ সাল থেকে ইউনেস্কো 'সংস্কৃতি দশক' পালন শুরু করেছে। এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শন তথা পুরাকীর্তি সংরক্ষণে ইউনেস্কো সহযোগিতার কর্মসূচী গ্রহণ করে। এখানে বলে রাখা ভাল যে ইউনেস্কোর সাথে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সমিতি বাংলাদেশে ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সদস্য হিসেবে কমিশনের কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

শিল্প ও সংস্কৃতির ওপর ইউনেস্কো মনোযোগ দেয়ার পাশাপাশি উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করে আসছে।

ইউনেস্কোর যখন যাত্রা শুরু হয়েছিল তখন শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। পরবর্তীকালে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে মানবাধিকার, সংস্কৃতি, যুব ও মহিলা মর্যাদা উন্নয়ন, তথ্য ও গণযোগাযোগ ব্যবস্থাসহ আরও বহু বিষয় যেমন মানব মনে শান্তি। এই 'মানব মনে শান্তি' কথাটি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। যুদ্ধের ধারণার উৎপত্তি মানব মনে। মানুষের স্বার্থ বুদ্ধির উপর চিত্তের সম্পদকে স্থান দেয়াটা শিক্ষা দিয়েই সম্ভব। শিক্ষা মনুষ্যত্বের প্রকাশকে মূল্য দিতে শিখায়। আর এজন্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে দাঁড়াবার পথ শিক্ষা চিনিয়ে দেয়। এ জন্যই বিংশ শতকের শেষ দশকে শিক্ষাধারাটা আরও এগিয়ে নেয়ার জন্য ইউনেস্কো সাক্ষরতাকে শুধু লিখতে ও পড়তে পারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকার কথা বলেছে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যতীত শিক্ষার লব্ধ জ্ঞান যেমন অসম্পূর্ণ তেমন মানবাধিকার ও সামাজিক সচেতনতার সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করা না হলে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। যে জ্ঞান মানুষকে নিজেকে চিনতে শিখায়, শিখায় তার পারিপার্শ্বিক কার্যকারণ সম্পর্কে সচেতন হতে, যা তাকে বলে দেবে শান্তির পথ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। ... মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের (প্রথম মহাযুদ্ধ– লেখক) পর ইউরোপ যখন শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোট ছোট জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠছে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তা হলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিমাত্রা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের ওপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে; আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।" জাতিসংঘ নিয়েছে জাতি বিশেষে মুক্তির কর্মসূচী আর ইউনেস্কোর উপর ভার পড়েছে এই মানব মুক্তির।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নায়করা প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেদিন রবীন্দ্রনাথ 'মনুষ্যত্বের এই প্রতিকারহীন পরাভব' সম্পর্কে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে বলেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে শুভবুদ্ধির সূচনার যে লক্ষণ রাষ্ট্রনীতিতে প্রকাশ পেয়েছিল তাকে আছন্ন করেছিল হিরোশিমার উপর আণবিক বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংসের ভয়াবহ সাফল্য। সেখান থেকে বের হওয়ার পথের পত্তন ঘটেছিল জাতিসংঘের মধ্যে। বার বার নানা স্বার্থের দ্বন্দ্বে মানব সমাজের কাছে একথাটা ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি ভূগোলের বেড়া লোপ করে দিচ্ছে। মানব মনের বেড়াকে টিকিয়ে রাখার জন্য এরকম অবস্থায় যে বাধাগুলো বড় তার অন্যতম হল মানুষকে মর্যাদাবান করার পথের উপরে নিরক্ষরতার জগদ্দল পাথর। সেখানে ইউনেস্কো মানুষের মূল ঐক্যের সূত্রটি হিসেবে বেছে নিয়েছে শিক্ষা। আর এই শিক্ষার পাশাপাশি ইউনেস্কোর অন্যান্য সকল কর্মসূচী। ইউনেস্কোর কোন কর্মসূচীই শিক্ষা থেকে বিযুক্ত নয়। এই শিক্ষাকে যুক্তির পথ ধরে গ্রহণের নামই মনুষ্যত্ব। ইউনেস্কোর মুখবন্ধে বলা হয়েছে। যেহেতু মানুষের মনেই যুদ্ধের সূত্রপাত সেহেতু মানুষের মনেই শান্তির প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে হবে। ইউনেস্কোর সংবিধানের প্রস্তাবনায় একটি শান্তিপূর্ণ নয়া বিশ্ব সম্প্রদায় গড়ে তোলার কথাটা স্থান পেয়েছে যেখানে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে মানব মর্যাদা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি। ইউনেস্কোর সংবিধান যুদ্ধকে আমাদের অন্তর্গত সকল অবিশ্বাসের চূড়ান্ত ফসল বলে চিহ্নিত করেছে। তাই নৈতিক আদর্শ স্থাপন ইউনেস্কোর অন্যতম মূল লক্ষ্য। সংবিধানে একথাটা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে ইউনেস্কোর শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রচেষ্টাকে জোরদার করে জাতি, ধর্ম, ভাষা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সমভাবে ন্যায়নীতি, আইন-শৃঙ্খলা, মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করতে সহায়তা করবে।

ইউনেস্কোর এই কার্য সাধনের পন্থার মধ্যে রয়েছে ভাবধারার আদান-প্রদান উন্মুক্ত রাখা এবং আরও অনেক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সকল দেশের মুদ্রিত উপাদান সকল মানুষের ব্যবহারের অধিকার।

ইউনেস্কোর এই শেষের কথাগুলো কাজে পরিণত করার প্রতি আমরা কতখানি আন্তরিক তা এই দিবসটি প্রায় অলক্ষ্যে বিদায় কি প্রমাণ করে না? তাই অশিক্ষার বিরুদ্ধে মানববন্ধের মশাল হিসেবে শিক্ষাই পথ দেখাতে পারে।